ভ্রমণ

চিরবসন্তের দ্বীপ তাসমানিয়া

রাবেয়া খাতুন

দ্বীপের নাম তাসমানিয়া। অস্ট্রেলিয়ায় যতগুলো সুন্দর শহর আছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাপের ওপরের দিকের গোলকোস্ট, নিচের দিকের তাসমানিয়া।

গোলকোস্ট দেখা হয়ে গেছে। এবার এসেছি তাসমানিয়া। সারা পৃথিবী যখন তীব্র গরমে অতিষ্ঠ, আমরা তখন মোটা সোয়েটার, কার্ডিগান, ওভারকোট পরেও শীতে কাঁপছি। জুন-জুলাই মাসে গোটা বিশ্ব একদিকে, অস্ট্রেলিয়া অন্যদিকে। মানে এখানে তখন পুরো শীতের মওসুম। আবহাওয়ার মেজাজ কখনো মাইনাস নয়-দশে চলে যায়। ঘন কুয়াশা। কখনো চলমান মেঘের আনাগোনা। দুহাত তফাতে কী আছে ঠাহর করা যায় না।

এমনি ওয়েদারে আমরা নেমেছি সিডনি আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে। শীতের চেয়েও বেশি জ্বালাচ্ছে সিকিউরিটি। দুজন দুটি কুকুর নিয়ে ঘুরছে। জীবন্ত বিভীষিকার মতো দাপটে এগুচ্ছে সারমেয় দুটি।

রক্ষীরা যাত্রীদের মালামাল মেশিনে দিয়েও নিশ্চিন্ত নয়। এর বাক্স খোলে, ওর ব্যাগ পরীক্ষা করে। বিজয়ের লম্বা হাসি দিয়ে এইমাত্র একজনের স্যুটকেসের তলা থেকে শুকনো মিষ্টির বাক্স ছুঁড়ে দিয়েছে কুকুরের দিকে। খাবার নিষিদ্ধ। গাছগাছড়ার বীজও। এদের সিকিউরিটি ব্যবস্থা অন্যান্য মহাদেশ থেকে একটু বেশি। মাঝে প্রশান্ত মহাসাগর নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ভূগোলের মধ্যে থেকেও আলাদা।

সে ধকল কাটিয়ে বাইরে আসতেই দুরন্ত ঠাণ্ডার কামড়।

বাইরে আরজুরা অপেক্ষা করছে দুটি গাড়ি নিয়ে। আমরা টপাটপ ঢুকে গেলাম। আহ্, বাঁচা গেল। ভেতরে মৃদু মিষ্টি হিটারের তাপ। এখান থেকে মূল শহরের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোর মতো। পথ ভরা অশান্ত কুয়াশার ছুটোছুটি। পথের আলো ধোঁয়াসা প্রকৃতিকে নিরাপদ করতে পারেনি।

সবে সন্ধ্যা। তবু রাস্তাঘাট প্রায় খালি। এমন দুর্যোগে নেহাত দরকার ছাড়া কেউ গাড়ি বের করে না। তবে মাঝে নাস্তাজাতীয় কিছু খেতে নেমে দেখা গেল ম্যাগডোনালসের পার্কিং লটে মেলা গাড়ি। ভেতরে নানা বয়সী মানুষের কোলাহল। প্রায় সবার মুখে টেম্পারেচারের মতলবি মেজাজের কথা। এবারের কুজঝটিকা ভোগাবে।

এমন ঠাণ্ডায় কিশোর-কিশোরীরা আইসক্রিম খাচ্ছে মহানন্দে। গা শিরশির করে। পরক্ষণে মনে হয়, এতে ওরা তো অভ্যস্ত। আমরা না হয় এসেছি বাইরে থেকে। আমাদের প্রয়োজন গরম খাবার ও পানীয়।

ওহ্, আমাদের দলেও কজন কিশোর ও শিশু আছে। ফায়জা, নাজোয়া, ফাইয়াজ, রেহান। রেহানের জন্ম সিডনিতে। বয়স তিনের কাছাকাছি। আচার-ব্যবহারে দিকগজ পণ্ডিত। শিশু নয়, জীবন্ত কম্পিউটার। কথা বলে বড়দের ভঙ্গিতে। ভাষাটা না ইংরেজি, না বাংলা। দুটোয় মেশানো জগাখিচুড়ি মার্কা। কথা বলে যায় আপন মর্জিতে। দেখতে এবং শুনতে মজাই লাগে। এই মুহূর্তে ছোট্ট মানুষটি আইস চুষছে। ছুটোছুটি করছে।

আবার গাড়ির হিটে। আরজুদের সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা। ওরা এখন স্থায়ী অভিবাসী এ দেশের। কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর বুশ ফায়ারের কথা বলল। আগুন বেশ দূরে ছিল। কিন্তু ওদের পাড়া ছেয়ে গিয়েছিল নিরন্ধ্র অন্ধকারে। পথচারীর চুলে লাগছিল সাদার ছোপ। নিঃশ্বাসে টান। সরকারি উদ্যোগ জানপ্রাণ দিয়ে চলছিল। অগ্নির ধাবমান অগ্রসর হেলিকপ্টার দিয়ে নির্বাপণের চেষ্টায় অবশেষে আয়ত্তে আসে। বুশ ফায়ার অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সমস্যার অন্যতম একটি।

নানা রকম ভালোমন্দ কথার আদান-প্রদানের মধ্যে কখন পথ শেষ হয়ে এল টের পেলাম না। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে প্রকৃতি কাতর বোঝা গেল বাসার আলোতে। লনের ধারে আরজুর চমৎকার বাগান গতবার দেখে গেছি। গৃহপালিত পুষ্পবীথির কিছু এখনো সবুজ। বাকিরা পাতাঝরা সাময়িক মৃত্যুর কাছে।

ঢাকা টু সিডনি। দীর্ঘ পথযাত্রার একঘেয়ে ক্লান্তি। তবু প্রিয়জনদের সঙ্গে অনেকটা রাত কাটিয়ে শুতে এলাম। জানালার বাইরে কুয়াশা। কাছের বাড়িটি আবছা দেখা যায়। ওরা ঘুমন্ত। মি. আব্রাহাম তার স্ত্রী। পাঁচজন ছেলেমেয়ে। অস্ট্রেলিয়ানরা সাধারণত তিন ছেলেমেয়ে নেয়। আব্রাহাম পরিবার ব্যতিক্রম। ছেলেমেয়ে প্রত্যেকের বয়স আঠারো প্লাস। এ সময় সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে থাকে। কেউ কেউ একাও কাটায়। কিন্তু বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকে না। আব্রাহাম পরিবার আছে বিপদের মধ্যে। কেমন বিপদ। পাঁচটি সন্তানের কেউ অন্যত্র মুভ করছে না।

দোতলা বাড়ি। প্রত্যেকের জন্য একটা করে ঘর। নিচে পাঁচটা গ্যারেজ।

আরজুর বাড়ির সঙ্গে সীমানা ভাগ করা খাটো কাঠের পার্টিশন আর গাছপালা দিয়ে। নানা সময় কথা হয়। বেশির ভাগই ভেজা কাপড় শুকাতে দিতে গিয়ে। মিসেস আব্রাহাম শুকনো মুখে বলেন, কেমন করে ভালো থাকব বল। পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে ঘাড়ের ওপর। এত করে একেকজনকে বলি তবু নড়ে না। পাঁচটা গ্যারেজ ওরা দখল করে রাখলে আমাদের দুটো রাখি কোথায়?

ব্রেকফাস্ট সকালে একসঙ্গে কর না?

কই আর। মেয়ে দুটো অবশ্যি কোনো কোনো দিন সঙ্গী হয়। সেই যে ব্রেকফাস্ট

সারা দেশে পাতা ঝরার হাহাকার

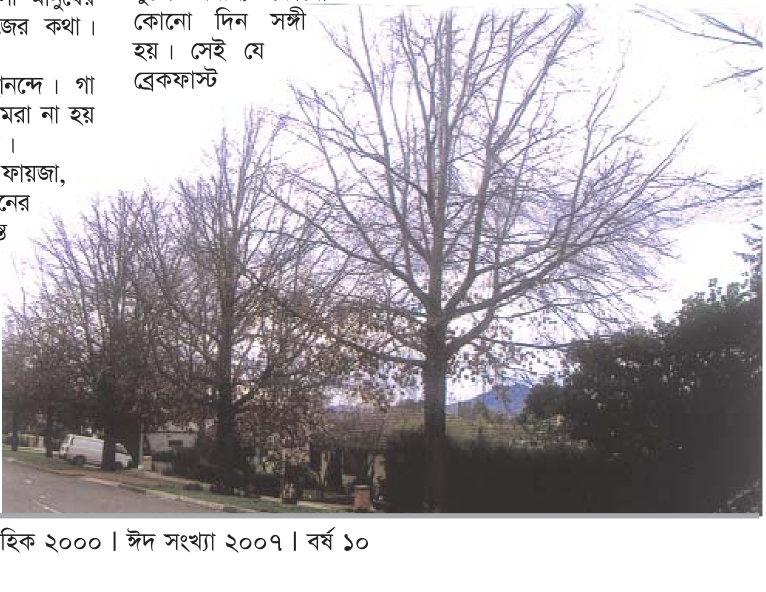

সেরে বের হয়, ফেরে যে কে কখন, সব দিন টেরও পাই না। নিজেদের খাবার নিজেরাই নিয়ে আসে কখনো। আচ্ছা, খাবার খরচা যদি চালাতে পারিস, বাকিগুলো পারিস না কেন? আসলে এত সুবিধা কোথায় পাবে? ঘর ভাড়া নেই, গ্যারেজ ভাড়া নেই, ফ্রিজ, কাপড় ধোয়ার মেশিন সব ফ্রি। সহজে হাতছাড়া করতে চায় কেউ এগুলো? আমরা রিটায়ার করেছি। আমাদেরও তো একটু আরাম চাই, না কি বল?

হঠাৎ মনে হলো বাড়ির কোণের ঘরের বাতি এখনো জ্বলছে। কে জানে কার ঘর ওটা। ছেলেমেয়েদের মধ্যেই কারও হবে। আমি কাদের কথা ভাবছি? আমার রাত জাগলে চলবে না। সকালের ফ্লাইটে চলে যাব তাসমানিয়া। আরজুরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও দ্বীপটা এখনো দেখা হয়নি।

শুতে এসে ঢাকা এয়ারপোর্টের কথা মনে পড়ল। আমাদের সি-অফ করতে এসেছিল সাগর। পৌঁছেই জানা গেল মালয়েশিয়ায় প্লেন এক ঘণ্টা লেটে যাবে। বারোটার প্লেন একটায়। সুতরাং বিজনেস ক্লাসের লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা।

যাত্রী আমরা পাঁচজন। মামুন, কাকলী, ফায়জা, ফাইয়াজ, আমি। মূল প্রোগ্রামটা ছিল কাকলীদের। আমিসহ। রোম আমার স্বপ্নের দেশ, শুরুতে পরিকল্পনা তেমনি ছিল। কিন্তু সেখানে এখন প্রচ দাবদাহ। রোম হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখার শহর। এই গরমে সে কি সম্ভব? দোটানায় দুলছি। এর মধ্যে যাব আবার হংকং। কাকলীকে বললাম, হংকং থেকে ফিরে এসে বলতে পারব,

তাসমানিয়া : ফুল ও সবুজের সমারহ

যাব কি যাব না।

ওরা বছরে একবার কি দুবার ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজের ছুটিতে চার সপ্তাহের জন্য বাইরে বেড়াতে যায়। এবার রোম করেছে আমারই কারণে। রোম থেকে আমেরিকা। আমি আমেরিকা যাব না। মেলা বার যাওয়া হয়েছে বিভিন্ন স্টেটে। শুধু রোম। কিন্তু ওয়েদারের কথা জেনে পিছপা হলাম। স্বপ্নের দেশ ঘুরতে গিয়ে ভর্তা হয়ে যাব। হংকং বেড়াতে গিয়ে বুঝলাম সেটা কত বাস্তব। ফিরে এসে কাকলীকে বললাম, না রোম যাওয়া হবে না।

আম্মা, আপনার জন্যই আমাদের এ রুট বেছে নেয়া।

তোরা ঘুরে আয়।

সে কী করে হয়!

ওরা জুন মাসে রুট চেঞ্জ করল। অস্ট্রেলিয়া টু আমেরিকা। সেখানে আবার প্রচণ্ড শীত। আপত্তি করলাম না। ক্যানবেরায় রয়েছে প্রবাল। দু-তিন বছর অন্তর একবার ওর কাছে যাই। থাকি টানা তিন মাস।

তাসমানিয়া নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকলেও যাওয়া হয়নি। মামুনের বড় বোন, দুলাভাই, আরজুদেরও নয়। সুতরাং ঠিক হলো প্রথমে তাসমানিয়া ঘুরে আমি চলে যাব ক্যানবেরা। কাকলীরা যাবে আমেরিকা।

জুলাইয়ের ৬ তারিখে রাতে রওনা। মাঝে মালয়েশিয়ায় ঘণ্টাখানেক স্টপ ওভার। কিন্তু সে প্লেন কোথায়? একটা, দুটো, তিনটের দিকে এগুচ্ছে ঘড়ির কাঁটা। বলা হচ্ছে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এই বিড়ম্বনা। সাগরকে বারবার ফিরে যেতে বললাম। ঢাকায় তখন তুমুল রাজনৈতিক গণ্ডগোল। একদণ্ডের আস্থা নেই– কোথায় কী হয়! খুন, জখম, মারামারি, ক্রসফায়ার, ডাকাতি, রাহাজানি লেগেই আছে।

সাগর তবু ওঠে না। এদিকে সময়ের কাঁটা তিনটা ছুঁই ছুঁই। এক রকম জোর করে আমি আর কাকলী ওকে বাড়ির পথ ধরালাম। বাসায় ফিরে ও মোবাইলে কল পাঠাল– ঠিকমতো পৌঁছেছে।

আমরা তখনো বসে লাউঞ্জে। সাড়ে তিনটার দিকে ডাকা হলো। বাকি পথটা যেন এই ওঠার, এই নামার। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। দেরির জন্য এয়ারক্রাফটের গতি এমন ছিল, দশটায় ল্যান্ড করার কথা, ঠিক তখনি প্লেন নামল। সে তো দায় খালাস। কিন্তু আরোহীদের জন্য প্রাণান্ত। মালয়েশিয়ায় গোল্ডেন লাউঞ্জে বেশভূষা বদলে, ব্রেকফাস্ট করে ধীরেসুস্থে অস্ট্রেলিয়ার উড়োজাহাজে উঠব। সে গুড়ে বালি। ছুটতে হলো। বিশাল এয়ারপোর্টের একদিকে এরোট্রেন দাঁড়িয়ে। আমাদের নিয়ে তার ছোটা এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এবং প্লেনে ঢুকে পড়া। এবার আট ঘণ্টার জার্নি...

কিন্তু রাত যে ফুরিয়ে আসছে। বিছানায় না গেলেই নয়। ঘড়িতে এলার্ম কখনো দেই না। ঘুমানোর আগে মনের ঘড়িতে যে টাইম দিয়ে রাখি, চোখ খোলে তখনি।

গৃহকর্ত্রী আরজু সবার নাস্তা দিয়ে, ওখানে গিয়েও খাবার নিয়ে কী পরিস্থিতিতে পড়বে সে আগাম ভাবনা ভেবে রেখেছে। খাবার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ানদের কিছু বাড়তি বাড়াবাড়ি আছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটেও।

বাইরে থেকে প্রতিদিন যেসব প্লেন আসে, কয়েকটি বড় শহরের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ছাড়া সেগুলো অবতরণের নিয়ম নেই। অভ্যন্তরীণ কোথাও যেতে হলেই এদের নিজস্ব এয়ারলাইন্স কোয়ানটাম। সেই কোয়ানটামের যাত্রী হয়ে চললাম তাসমানিয়া। এবারের টিম এগারোজনের।

জানালার ধারে বসে যতদূর চোখ যায় কেবলই পানি আর পানি। জলময় গোটা ভুবন। রোদের ঝিলিক। তিন স্তরে ভাগ করা আমার পৃথিবী। মাথার ওপর ঝকঝকে সুনীল আকাশ, মাঝের শূন্যে এই প্লেনটা। নিচে প্রশান্ত মহাসাগর। সে শুধু সুন্দর নয়। সব বেলার রঙে নানারূপে রূপমান। সাত সমুদ্রের আমার সবচেয়ে প্রিয় সমুদ্র। প্রবল তরঙ্গ আছে কিন্তু ভয় নেই। গর্জন আছে কিন্তু ভয়াবহতা নেই। মানে আমার ভ্রমণ সময়ে তার সৌখিন সুন্দর রূপই দেখেছি। ঘন নীল, নয়নতুষ্ট সবুজ আর সফেদ রঙের পোশাকে বেলায় বেলায় সে অপরূপ। প্রশান্ত মহাসাগর আমাকে কখনো ক্লান্ত করে না। সে যেন বিরাট শক্তিমান রূপবান পুরুষ। যার দর্শন প্রাণবন্ত করে রাখে আমার চিন্তার ভুবনকে।

নিজেকে মনে হয় সুখী মানুষদের একজন। না ঠিক বললাম না, আরো একজন সুখী মানুষ দেখছি। কাউকে গ্রাহ্য না করে সারা প্লেনে ছুটোছুটি করছে রেহান।

ভাবনায় ভাঙন আসে। প্লেন ল্যান্ড করেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় বড় শহরের এয়ারপোর্টগুলো সবই অনাড়ম্বর, জৌলুসহীন। ওদের রাজস্ব খাতে এর জন্য নাকি বাড়তি বাজেট নেই। সেই হিসেবে তাসমানিয়ার যেটুকু প্রাপ্য তেমনি চলনসই। স্ত্রী-পুরুষ দুজন কর্মী দাঁড়িয়ে। সার্চ করবে। সঙ্গে কিছু আছে কি না। বিশেষ করে খাবার-দাবার। আরজুর বর আঙ্গুর, আপেল সঙ্গে নিয়েছিল। তার ভাবনাটা হয়তো এমন ছিল– একে তো ফল, তার ওপর এক দেশ। দোষ ধরবে না। কিন্তু উহু বলতে গেলে কেড়ে নেয়ার ভঙ্গিতে সেটা চলে গেল। হোক এক দেশ। ফলও নিষিদ্ধ। এদিকে মহিলাটি সারচিং মেশিন হাতে আমার দিকে এগিয়ে এসেও জরি চুমকিদার শিফন জর্জেটের আঁচল স্পর্শ করে বলছে, তোমাদের এই পোশাকটি এত চমৎকার, বলতে গেলে রাজকীয়। ওয়েলকাম তাসমানিয়া।

ধন্যবাদ জানিয়ে সবাই তো এলাম কিন্তু আরজু কোথায়? বাইরে এসে দেখি খাবারের বাক্স ওড়নার আড়াল করে সে দাঁড়িয়ে। কাকলীকে বলল, তোমার দুলাভাইকে আঙ্গুরসহ ওরা যেভাবে ধরল, আমি তখনি পগারপার। বড় দল বলে ওরা ঠাহর করতে পারেনি। আঙ্গুর, আপেল যখন আসামি, আমার সলিড খাবার দেখলে ওদের চোখ তো উল্টে যেত।

আরজুকে মনে মনে সাবাস দিলাম। কেননা, ও যদি ওই রিস্কটুকু না নিত সে দুপুরটা আমাদের ঠিক সময় খাওয়া হতো না।

এয়ারপোর্টের বাইরে চমৎকার রোদ এবং গাছের সবুজ। শীতের ধকলের মধ্যেও ন্যাড়া নয় এখানকার পরিবেশ। আমাদের কৃষ্ণচূড়া জাতীয় কিছু গাছ আছে ওখানে; যার ফুলের রঙ হলুদ, গোলাপি ও বেগুনি। তেমনি বিশাল তিন-চারটা গাছ ফুলে ফুলময়। শীত-রাক্ষস যেন এদের গিলতে গিয়েও পারেনি। সারা পথ সবুজ। পাহাড়ি পথে উঠতে উঠতে যে বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল, সেটায় রিজার্ভেশন দেয়া ছিল।

ল্যান্ড লর্ড মি. ড্যানিয়েল এলেন। ডাইনিং রুমে এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, তোমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি। এই দ্যাখো পাউরুটি, এই জ্যাম, জেলি, চা ও কফি। আশা করি দিন ভালোই যাবে।

আমাদের ধন্যবাদ নিয়ে তিনি চলে গেলেন।